25.4. মহীশূর রাজ্যের উত্থান ও ইঙ্গ-মহীশূর সম্পর্ক (Rise of Mysore : Anglo-Mysore Relations)

• **মহীশূর রাজ্যের উত্থান :** মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষীরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে হায়দার আলির নেতৃত্বে মহীশূর রাজ্যের উত্থান ভারতের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দক্ষিণ

ভারতে ইংরেজ শক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল মহীশূর রাজ্য। মহীশূর রাজ্যের দুদিকে পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বত ও দক্ষিণে কাবেরী নদী বেষ্টিত থাকায় শত্রু সৈন্য প্রবেশ সহজসাধ্য ছিল না। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে ওদিয়ারের হিন্দু রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে হায়দার আলি ক্ষমতা দখল করেন। হায়দার ছিলেন একজন ফৌজদারের পুত্র। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি মহীশূরের রাজার অধীনে সামান্য একজন সৈনিকের চাকুরি গ্রহণ করেন এবং ক্রমে তাঁর প্রতিভাবলে মহীশূর রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে নিজ ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর হায়দার আলি আধুনিক কায়দায় সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠিত করে বিদনুর, সুন্ডা, সেরা, কানারা, চিতলদুর্গ, হরপনালি ও সাভানুর প্রভৃতি স্থান দখল করেন। এর ফলে হায়দারের নেতৃত্বে মহীশূর একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়।

মহীশূরের অর্থনীতি : মহীশূর রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের কৃষ্ণ মৃত্তিকায় উৎকৃষ্ট মানের তুলো উৎপাদিত হত এবং রাজ্যের পশ্চিমদিক ছিল কৃষি প্রধান অঞ্চল। হায়দার আলির সময়ে মহীশূর রাজ্যে অসংখ্য দক্ষ কারিগর বসবাস করত এবং মহীশূর রাজ্যের বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল। জনৈক ইংরেজ পর্যটক এডওয়ার্ড মুর মহীশূর রাজ্য সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে— কৃষি সমৃদ্ধ এবং পরিশ্রমী মানুষের দ্বারা জনবহুল অঞ্চল, নতুন শহর গড়ে উঠেছে এবং বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ঘটেছে। (Well cultivated, populous with industrious inhabitants, cities newly founded and commerce extending)। সাম্প্রতিককালের মহীশূরের ইতিহাসবিদ চিকেরভের মতে, মহীশূরের ইক্ষু চাষের পদ্ধতির মধ্যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন উপকরণের সূচনা হয়েছিল। মহীশূরের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল ব্যাবসা-বাণিজ্য। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয়প্রকার বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য হায়দার আলি ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান পশ্চিম এশিয়ার এডেন, জেদ্দা, ওরমুজ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য দূত প্রেরণ করেন এবং বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন। মশলা, চন্দন, কাঠ, মিহিচাল প্রভৃতি পণ্য জলপথে রপ্তানি করা হত। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উন্নতির জন্যও বিভিন্ন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শিল্পের উন্নতির জন্য টিপু সুলতান বাঙ্গালোর, শ্রীরঙ্গপত্তম, বেদনুর ও চিতল দুর্গে রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা গড়ে তুলেছিলেন। এই কারখানাগুলিতে ছুরি, কাঁচি, ঘড়ি, কাগজ ছাড়াও কামান, বন্দুক ইত্যাদি তৈরি করা হত। এইভাবে ব্যাবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে রাজকোষে প্রচুর অর্থাগম হত।

শাসনব্যবস্থা : ক্ষমতা লাভের পর হায়দার আলি স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেও তিনি মহীশূরকে একটি জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সুলতান ছিলেন সমস্ত ক্ষমতার উৎস। হায়দার আলি সমগ্র প্রশাসনিক কাজকর্মকে ১৮টি দপ্তরে ভাগ করে প্রতিটি দপ্তরের ভার বিভাগীয় প্রধানের হাতে ন্যস্ত করেন। সুলতানের পরই ছিলেন দেওয়ান, পুলিশ, নিরাপত্তা ও গুপ্তচর বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন শামিয়া নামক একজন ব্রাহ্মণ। টিপু সুলতান শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে সাতটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রদেশের শাসনকর্তাকে 'আশরফ' এবং সৈন্য বিভাগের প্রধানকে 'ফৌজদার' বলা হত। এন. কে. সিনহা এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—His (Haidar's) administration gives us an illustration of Montesquieu's dictum that the principle of despotism is fear". স্বৈরতন্ত্রের উপর শক্তিশালী শাসনযন্ত্র গড়ে তোলা হায়দারের লক্ষ্য ছিল।

ভেরেলেস্ট প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৬৭ খ্রিঃ) : মহীশূরের উত্থানে ফরাসিরা হায়দারের পাশে দাঁড়ালে ইংরেজরা শঙ্কিত হয়ে পড়ে। হায়দার আলির সঙ্গে ফরাসিদের ঘনিষ্ঠতা ইংরেজদের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল। নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার সময় হায়দার ফরাসিদের সাহায্য পেয়েছিলেন। ফলে কৃতজ্ঞ হায়দার তৃতীয় কর্ণাটের (ইঙ্গ-ফরাসি) যুদ্ধে ফরাসিদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া চাঁদাসাহেবের পুত্র রাজা সাহেবকে তিনি তাঁর অধীনে চাকুরি দিয়েছিলেন। ফলে ইংরেজরা এবং আর্কটের নবাব মহম্মদ আলি হায়দারের উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা হায়দ্রাবাদের নিজামের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে মহীশূর রাজ্য আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা হয়।

ইংরেজ কোম্পানি ও নিজামের মিলিত বাহিনী মহীশূরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে (১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে)। এই পরিস্থিতিতে হায়দ্রাবাদের নিজামের মিত্র পেশোবা মাধব রাও মহীশূর রাজ্যের উপর ব্যাপক লুণ্ঠন চালান। অসাধারণ কূটনীতিবিদ হায়দার আলি ত্রিশক্তি জোটের আক্রমণে ভীত না কহয়ে ত্রিশক্তি জোট ভাঙতে প্রয়াসী হন। তিনি মাহফুজ খানের মাধ্যমে নিজামকে প্রচুর উপঢৌকন পাঠান। ফলে নিজাম ত্রিশক্তি জোট থেকে সরে দাঁড়ান। অন্যদিকে ২৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মারাঠাদের সঙ্গে একটি চুক্তি করার ফলে মারাঠারা মহীশূর ত্যাগ করে। ফলে ইংরেজ কোম্পানি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে।

১৭৬৭-৬৮ খ্রিস্টাব্দে হায়দার আলি ও ইংরেজদের মধ্যে অনেকগুলি যুদ্ধ হয়। চঙ্গাম ও ত্রিনোমালির যুদ্ধসহ আরও কয়েকটি যুদ্ধে হায়দার আলি ও নিজামের সৈন্যবাহিনী ইংরেজ সেনাপতি কর্নেল স্মিথের কাছে পরাজিত হয়। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে নিজাম হায়দারের পক্ষ ত্যাগ করে পুনরায় ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিলে হায়দার একাই যুদ্ধ চালিয়ে যান। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে হায়দার আলি তাঁর সুদক্ষ ও ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন অশ্বারোহী বাহিনীর সাহায্যে ইংরেজ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে মাদ্রাজের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হন। মাদ্রাজের পতন আসন্ন দেখে শঙ্কিত মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ হায়দারকে সন্ধির প্রস্তাব দেন। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ এপ্রিল হায়দার আলি ও ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে একটি সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে হায়দার আলি ও ইংরেজ পরস্পর বিজিত অঞ্চল ও যুদ্ধবন্দী প্রত্যার্পণে রাজি হয়। এছাড়াও স্থির হয় যে উভয় পক্ষের কেউ কোনো তৃতীয় শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হলে একে

অপরকে সাহায্য করবে। ঐতিহাসিক ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিনহা বলেন, ভারতীয়দের মধ্যে হায়দার প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে ইংরেজদের পরাস্ত করে নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন। এই যুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থ এবং মর্যাদা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। ডঃ নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ যুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন যে—"It was the first war in which the British government finished by suing an Indian Power for peace." (এই প্রথম একটি যুদ্ধে ইংরেজরা নিজে থেকে একটি ভারতীয় শক্তির সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিল।)

○ **ওয়ারেন হেস্টিংস—দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ :** ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন। প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একথাই প্রমাণিত হয়েছিল যে, ব্রিটিশরাই ভারতীয় রাজ্যগুলির বিশেষ করে মহীশূরের প্রধান শত্রু। এই সময় মারাঠারা মহীশূর আক্রমণ করলে পূর্বের সন্ধির শর্ত অনুসারে ইংরেজরা হায়দারকে সাহায্য না করে নিরপেক্ষ থাকে। এছাড়া তারা মালাবার উপকূলের মাহে বন্দর অধিকার করে। হায়দার আলি মারাঠাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূত্রপাত হয় (১৭৮০-৮৪ খ্রিস্টাব্দে)। মারাঠাদের সঙ্গে ইংরেজরা শান্তি স্থাপন করলেও মহীশূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। এই সময় ফরাসি সেনাপতি স্যাফ্রেন এক নৌবহর নিয়ে ভারতে আসলে হায়দার শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। কিন্তু হঠাৎ ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে হায়দার আলির মৃত্যু হলে তাঁর সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যান। তিনি ম্যাঙ্গালোর দখল করেন। অবশেষে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ সরকার টিপুর সঙ্গে সন্ধি করেন যা ম্যাঙ্গালোর সন্ধি নামে খ্যাত। সন্ধির শর্তানুসারে পরস্পর পরস্পরের বিজিত স্থানগুলি ফিরিয়ে দেন। এইভাবে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটে।

25.5. প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৭৭৫-৮২ খ্রিঃ) (The first Anglo-Maratha War)

● **গৃহবিবাদের সূত্রপাত :** ১৭৬১ খ্রিঃ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠা শক্তি সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে ২০ জুন ভগ্ন হৃদয়ে পেশোয়া বালাজি বাজিরাও-এর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র প্রথম মাধব রাও ১৭ বছর বয়সে পেশোয়া হন। মাধব রাও-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে কিছুদিনের মধ্যেই মারাঠা শক্তির পুনরাভ্যুদয় হয়। নিজাম, হায়দার আলি, ভোঁসলেকে পরাজিত করে মারাঠা শক্তি দাক্ষিণাত্যে অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। শুধু দাক্ষিণাত্যেই নয়, দিল্লি ও দোয়াব অঞ্চলেও মারাঠা শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে পেশোয়া মাধব রাও-এর অকাল মৃত্যুতে মারাঠাদের এই অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যায়। মাধব রাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নারায়ণ রাও পেশোয়া পদ লাভ করেন। নাবালক নারায়ণ রাওয়ের অভিভাবক রূপে ক্ষমতা লাভ করেন তাঁর পিতৃব্য রঘুনাথ রাও। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী রঘুনাথ রাও পেশোয়া পদ লাভের জন্য আগ্রহী ছিলেন। তাঁরই চক্রান্তের ফলে নারায়ণ নিহত হলে রঘুনাথ রাও পেশোয়া হন। কিন্তু রঘুনাথ রাওয়ের আচরণে ক্ষুব্ধ মারাঠা নেতৃবৃন্দ রঘুনাথ রাওকে পেশোয়া পদ থেকে বিতাড়িত করে মৃত নারায়ণ রাওয়ের শিশুপুত্র মাধব রাও নারায়ণকে পেশোয়া পদে অভিষিক্ত করেন (১৭৭৪ খ্রিঃ)। রঘুনাথ রাওকে বিতাড়িত করার ফলে পেশোয়া পদকে কেন্দ্র করে মারাঠাদের মধ্যে গৃহবিবাদ শুরু হয়।

○ **প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ :** পেশোয়া পদ থেকে বিতাড়িত রঘুনাথ রাও পেশোয়া পদ লাভের জন্য বোম্বাইয়ের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে রঘুনাথ রাও এবং বোম্বাই-এর ইংরেজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে সুরাটের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির মধ্য দিয়ে স্থির হয় যে, বোম্বাই কর্তৃপক্ষ রঘুনাথ রাওকে সামরিক সাহায্য দেবে। বিনিময়ে রঘুনাথ রাও কোম্পানিকে সলসেট ও বেসিন প্রদান করবে এবং যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে। অতঃপর ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে রঘুনাথ রাও ও ইংরেজদের মিলিত বাহিনী আরাসের যুদ্ধে মারাঠা বাহিনীকে পরাজিত করে। সুরাটের সন্ধি অনুসারে রঘুনাথ রাও পুনেতে পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী বাংলায় নিযুক্ত কোম্পানির গভর্নর জেনারেলের অনুমতি না নিয়ে বোম্বাই কর্তৃপক্ষের কোনো দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে চুক্তি করার অধিকার ছিল না। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস সুরাটের সন্ধি অনুমোদন না করে মারাঠাদের সঙ্গে ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে পুরন্দরের সন্ধির দ্বারা শান্তি স্থাপন করেন। পুরন্দরের সন্ধির ফলে ইংরেজরা রঘুনাথ রাও-এর পক্ষ ত্যাগ করে। বোম্বাই সরকার সুরাটের সন্ধি অনুমোদনের জন্য ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে। ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ সুরাটের সন্ধি অনুমোদন করলে পুরন্দরের সন্ধি বাতিল হয়ে যায়। ফলে পুনরায় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হয়।

সলবাই-এর সন্ধি : ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ পুনরায় শুরু হলে ইংরেজ বাহিনী তেলেগাঁও-এর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মারাঠাদের সঙ্গে অপমানজনক ওয়াড়গাঁও-এর সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস এই সন্ধি অস্বীকার করে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত মহাদজী সিন্ধিয়ার উদ্যোগে ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে সলবাইয়ের সন্ধি দ্বারা ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী—(ক) ইংরেজরা মাধব রাও নারায়ণকে পেশোয়া রূপে মেনে নেন। (খ) ইংরেজরা সলসেট, বেসিন ও বোম্বাই সন্নিহিত কিছু অঞ্চল লাভ করে। (গ) মারাঠা সরকার রঘুনাথ রাওকে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা বৃত্তি হিসাবে দিতে স্বীকৃত হয়। (ঘ) ইংরেজরা মারাঠাদের বিজিত অঞ্চল প্রত্যর্পণ করে। (ঙ) মারাঠারা মহীশূরের হায়দার আলির পক্ষ ত্যাগ করে।

ভারতে ইংরেজ কোম্পানির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে সলবাই-এর সন্ধির গুরুত্ব অপরিসীম বলে কেমব্রিজ ঐতিহাসিকরা

করেন। তাঁদের মতে এই সন্ধি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে মারাঠাদের পতন সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু 'New History of the Marathas' গ্রন্থে ঐতিহাসিক সরদেশাই বলেছেন যে, কেমব্রিজ ঐতিহাসিকদের দাবি যথার্থ নয়। কারণ সালবাই-এর সন্ধির মধ্য দিয়ে ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের প্রয়োজন হত না। মারাঠা শক্তির পতন সালবাই-এর সন্ধির মধ্য দিয়ে হয়নি, হয়েছিল পরবর্তীকালে যোগ্য মারাঠা নেতাদের মৃত্যু ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পরে দীর্ঘ কুড়ি বছর ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে শান্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়ের মধ্যে ইংরেজ শক্তি মহীশূর রাজ্যের পতন ঘটিয়ে এবং নিজামকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে এনে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করেছিল।

লর্ড কর্নওয়ালিশ—তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ : ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হন লর্ড কর্নওয়ালিশ। তিনি ভারতে এসেই উপলব্ধি করেন যে, দক্ষিণ ভারতে টিপুর শক্তি বৃদ্ধি ইংরেজ স্বার্থের পরিপন্থী। সুতরাং, যে-কোনোভাবে টিপুকে তিনি খর্ব করার সংকল্প গ্রহণ করেন। অন্যদিকে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য জেনে টিপু সুলতান ফ্রান্স ও তুরস্কের সাহায্য লাভের চেষ্টা করেন। ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশ মুসলিপত্তমের সন্ধির দ্বারা নিজামকে বাল্লাঘাট জেলা দিতে রাজি হন এবং গোপনে টিপুর বিরুদ্ধে শক্তিজোট গঠনে প্রয়াসী হন। ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি ভঙ্গ করায় ক্রুদ্ধ টিপু ইংরেজদের আশ্রিত রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করেন। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূত্রপাত হয় (১৭৯০-৯২ খ্রিস্টাব্দ)। লর্ড কর্নওয়ালিশ মারাঠা ও নিজামের সঙ্গে মিলিত হয়ে টিপুর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে কর্নওয়ালিশ টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম অবরোধ করেন। এই অবস্থায় টিপু সন্ধি করতে বাধ্য হন। এই সন্ধি শ্রীরঙ্গাপত্তমের সন্ধি নামে খ্যাত। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী টিপু ইংরেজদের ক্ষতিপূরণ বাবদ বহু অর্থ ও মহীশূর রাজ্যের একাংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। এই যুদ্ধের ফলে টিপুর গর্ব খর্ব হয় এবং দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের আধিপত্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।